অপরাধী আচরণের মনস্তত্ত্ব

ড. কাজী সাইফুদ্দীন
চেয়ারম্যান, মনোবিজ্ঞান বিভাগ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

মানব সমাজে অপরাধ আচরণ সচরাচই দেখা যায়। অপরাধ নেই এমন সমাজ খুজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব। অপরাধমূলক আচরণ বেআইনি, অনৈতিক, ধর্মবিরুদ্ধ এবং অপ্রত্যাশিত হওয়ার পরও সকল সমাজেই অপরাধ আচরণ কমবেশী পরিচালিত হয়। স্থান, কাল, পাত্র ভেদে অপরাধের ধরণ বৈচিত্র পরিলক্ষিত হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ এ যুগে মানুষ নানাভাবে অপরাধমূলক আচরণের কারণ খুজে বেড়াচ্ছে। সমাজ থেকে এধরনের আচরনের মূল উৎপাটনের জন্য এর কারণ সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। অপরাধী আচরণের নানা কারণ গবেষণার মাধ্যমে বেরিয়ে এসেছে। এর মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক কারণ, সামাজিক কারণ, জৈবিক কারণ, অর্থনৈতিক কারণ, রাজনৈতিক কারণ, পরিস্থিতিমূলক কারণ, ইত্যাদিকে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যায়। তবে, মনোবিজ্ঞানীদের মতে, অপরাধমূলক আচরণের বাহ্যিক কারণ যাই হোক না কেন, তার মূল নিহিত রয়েছে অপরাধীর মনের গহিনে (Lembroso, Ferri, Garofalo)।

অপরাধী আচরণের মনস্তাত্ত্বিক কারণ আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই Sigmund Freud-এর তত্ত্ব বিশ্লেষণ প্রয়োজন। ভুবনখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েড মানুষের মনের গভীরে পরস্পর বিরোধী দুটি মৌলিক মানসিক শক্তির কথা বলেছেন। এর একটি হলো "জীবন প্রবৃত্তি" (life instinct) এবং অন্যাদি "মরণ প্রবৃত্তি" (death instinct)। জীবন প্রবৃত্তি জীবনের সকল ধনাত্মক কাজের মূল শক্তি, যা জীবনকে সুন্দর ও বিকশিত করতে সামনের দিকে পরিচালিত করে। কিন্তু মরণ প্রবৃত্তি ঠিক তার বিপরীত। এর কাজ হলো জীবনকে ঋনাত্মক পথে চালিত করা এবং ধ্বংসাত্মক কাজ পরিচালনা করা। এই দুই পরস্পর বিরোধী শক্তির লব্ধি অনুযায়ী ও মানুষের আচরণ পরিচালিত হয়। একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যেই রয়েছে মরণ প্রবৃত্তি। তাই সে যে কোন সময় বিশেষ পরিস্থিতিতে সংঘটিত করতে পারে চরম অপরাধ। অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই লুকিয়ে আছে হত্যা বা ধ্বংস করার এক সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা (destructive drive) আর সে কারণেই বলা হয় যে man is a homo-homani lepus। এই মরণ শক্তিটি বাহ্যিক পরিস্থিতির মাধ্যমে দুই ভাবে কাজ করতে পারে। এর একটি হলো আত্মহননমূলক অপরাধ (Lomocidal) এবং অপরটি পরঘাতীমূলক অপরাধ (genocidal) মানুষের মনের গভীরে ক্রিয়ারত এই পরস্পর বিরোধী শক্তি দুটি অবচেতন অবস্থান করে অন্য দুটি প্রক্রিয়ায় মাধ্যমে বহির্জগতের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে। এ দুটি হলে যথাক্রমে ইদম (Id) এবং অধিসত্ত্ব (Superego)। ইদম আদিম ও স্বার্থরতার মাধ্যমে তার সুখ ভোগের নীতিতে চলতে চায়। (Pleasure principle) এবং অধিসত্ত্ব চলতে চায়, নৈতিকতা ও মানবতার ভিত্তিতে (morality principle)। এই দুই শক্তির মধ্যে যখন দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় তখন আর একটি শক্তি এদের মধ্যে মিমাংসা করে দেয়। একে বলে অসম (Ego)। ইদমের তীব্র অসামাজিক ইচ্ছা যা অপরাধী আচরণে প্রকাশ পেতে চায় তাকে যুক্তি উপস্থাপনের মাধ্যমে নৈবৃত্ত করার চেষ্টা করে অহম তার প্রতিরোধ কৌশলের মাধ্যমে (defence mechanisms)। অন্যথায় ইদমের দ্বারা তাড়িত হয়ে ব্যক্তি অপরাধমূলক আচরণ করতে পারে। মানুষের অপরাধমূলক আচরণের পিছনে ইহাই অন্যতম কারণ।

এছাড়া ফ্রয়েডিও মনোসমীক্ষণবাদীরা মনে করেন যে, মানুষের প্রাপ্ত বয়স্ক অবস্থার অনেক অপরাধমূলক ও অসামাজিক আচরণের কারণ নিহিত থাকতে পারে তার শৈশবের ঘটনার মধ্যে। শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রক্রিয়া ত্রুটিপূর্ণ হলে অর্থাৎ তার ইদিপাস কমপ্লেক্স যথাযথ ভাবে বিকশিত না হলে তার মধ্যে অপরাধমূলক আচরণের বীজ ব্যাপিত হয় শৈশবেই যার প্রকাশ ঘটে পরবর্তীতে। এক্ষেত্রে ব্যক্তির মনে আগ্রাসী ও ধ্বংসাত্মক মনোভাব অবচেতন ভাবেই বেড়ে ওঠতে পারে।

অন্যদিকে আচরনবাদী মনোবিজ্ঞানীদের মতে অনেক অপরাধমূলক আচরণ সৃষ্টি হয় মূলত ব্যক্তির একটি পূর্ণ শিক্ষা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। অর্থাৎ যাদের সামাজীকরনে সামাজিক মূল্যবোধগুলো ত্রুটিপূর্ণ অথবা অপরাধের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ সেই সব ব্যক্তিগণই সেই অপরাধ সংগঠিত করতে পারে। বিশিষ্ট আচরণবাদী মনোবিজ্ঞানী J.B. Watson যখন আচরণের প্রকৃতিতে আইনের অথবা সামাজিক মূল্যবোধের বিষয়টি গৌণ থাকে তখন সেই ব্যক্তির পক্ষে সামাজিক আচরণ করা সহজ হয়। ব্যক্তি আচরণে অপরাধ সংঘটিত হওয়ার বিষয়টি অন্য একটি উপাদানের উপর নির্ভরশীল। আর তা হলো বলবর্ধক (reinforcement)। একত্রে ধনাত্মক ও ঋনাত্মক বলবর্ধক কাজ করে। কোন একটি অপরাধ সংঘটিত হবার পর যদি পুরষ্কৃত হয় তবে ব্যক্তি আরও অপরাধ করার চেষ্টা করে। এভাবে বার বার পুরষ্কার ধনাত্মক বলবর্ধক হওয়ায় ব্যক্তির মধ্যে অপরাধমূলক আচরণ করার প্রবণতা দেখা দেয়।

কিছু মনোবিজ্ঞানী যেমন, Willium Sheldon, Carl Yung ও অন্যদের মতে কতগুলো বিশেষ ধরনের শারীরিক গঠনের সাথে অপরাধ আচরণের ধনাত্মক সম্পর্ক রয়েছে। তাদের আলোচনায় আমরা দেখতে পাই যে শারীরিক গঠনের ধরন বৈচিত্রের সাথে বিশেষ কিছু আচরণের মিল আছে যা ব্যক্তির ব্যক্তিত্বে প্রকাশ পায়। এই ভাবে বিশেষ ধরনের কতগুলো ব্যক্তিত্ব অপরাধী আচরণের সাথে সম্পৃক্ত।

মানুষের অপরাধমূলক আচরণের পেছনে আরও একটি বিষয় কাজ করে। তা হলো ব্যক্তির মানসিক অসুস্থতার বিষয়টি। কতগুলো ব্যক্তি সহজেই অপরাধ কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়তে পারে। Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV) অনুযায়ী জ্ঞানগত গোলযোগ (Delirium এবং Dementia) মনোবিকারগত গোলযোগ (Schezophrenia), ব্যক্তিত্বের গোলযোগ (Antisocial personality এবং Paranoid

personality) মেজাজের গোলযোগ ইত্যাদি মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তি নানারকমের, অসামাজিক ও অপরাধমূলক আচরণ করতে পারে।

অপরাধমূলক আরচণের আর একটি মনস্তাত্ত্বিক কারণ হলো পরিবেশগত চাপ। ব্যক্তি যদি এমন কোন অবস্থার মধ্যে পতিত হয় যে বাধ্য হয়েই তাকে আইন অমান্য করতে হয় বা অপরাধ করতে হয়, এরূপ ক্ষেত্রে ব্যক্তি তার আত্মরক্ষামূলক আচরণের অংশ হিসাবে সেই অপরাধ সংঘটিত করে। এ ধরণের আচরণ যদিও পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে উদ্ভুত তবুও এর পেছনে গভীর মানসিক উপাদানগুলো কাজ করে। এ ধরণের আচরণ যদিও পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে উদ্ভুত তবুও এর পেছনে গভীর মানসিক উপাদানগুলো কাজ করে।

এভাবে দেখা যায় যে মানুষের অপরাধমূলক আচরণের পেছনে বিভিন্ন রকমের মনস্তাত্ত্বিক কারণ নিহিত রয়েছে। অন্যান্য কারণগুলোর সাথে একাত্ম হয়ে এসব মানসিক কারণ ব্যক্তির মধ্যে অপরাধমূলক আচরনের জন্ম দিতে পারে । তাই অপরাধমূলক আচরনের ব্যাপ্তি কমাতে হলে অবশ্যই মানসিক কারণগুলো দূর করার চেষ্টা করতে হবে। আর সে কারণেই মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হবে নিপুণভাবে। তবেই সমাজ থেকে অপরাধমূলক আচরণের ব্যপ্তি কমিয়ে আনা সম্ভব হবে।

সুস্থ্য মন ঃ সৃজনশীল ও ছন্দময় জীবন

বিশ্বায়নের এই যুগে বাংলাদেশ দারিদ্রের দুষ্টচক্র ভাঙ্গনে অবিরাম চেষ্টারত। বর্তমানে সারা বিশ্বে বিরাজ করছে এক অদৃশ্য অস্থিরতা, যা শুধু ধনী বিশ্বেই নয়, এর প্রভাব পড়ছে আমাদের সমাজ ব্যবস্থায়ও। সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, দারিদ্র, অর্থনৈতিক বৈষম্য, সঠিক ধর্মীয় জ্ঞানের অভাব, প্রাকৃতিক দূর্যোগ, মানুষের দ্বারা সৃষ্ট বিভিন্ন ধরনের সংকট ও দূর্যোগ, দূর্ঘটনা, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, হত্যা, ধর্ষণ, লাগামহীন দূর্নীতি, সর্বোপরি পারিবারিক মূল্যবোধ ও আর্থসামাজিক বৈষম্য ইত্যাদি মনোসামাজিক বিষয়গুলো ব্যক্তিমানুষকে মানসিকভাবে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করছে।

বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের দেশের বিভিন্ন পেশার মানুষরাও আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য পরিচিত হচ্ছেন নতুন নতুন প্রযুক্তি ও বিকাশের সাথে। তারা তাদের সর্বোচ্চ মেধা ও শ্রম প্রয়োগ করছেন বিশ্বের দারবারে নিজেদের একটি অবস্থান তৈরী করবার জন্য। কিন্তু এরজন্য চাই সুস্থ্য শরীরের পাশাপাশি একটি সুস্থ্য মনের। সুস্থ্যমনের অধিকারীরা সবার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখেন, তারা কর্মক্ষেত্র ও পরিবারকে যথাযথ সময় দেন। ভারসাম্যপূর্ণ জীবন যাপনের জন্য তারা সুখী থাকেন ফলে তারা তাদের মেধা অর্থাৎ সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটাতে পারেন। সাঠিক চিন্তার, অনুভূতি এবং সঠিক আচরনের সমন্বয় নির্দেশ করে আমাদের মানসিক সুস্বাস্থ্য। জীবনের যেকোন সংকট মোকাবেলায় মানসিক স্বাস্থ্যের ভূমিকা খবই গুরত্বপূর্ন।

সৃজনশীল ও ছন্দময় জীবনের জন্য মনোবৈজ্ঞানিক কিছু কৌশল উল্লেখ করা হলোঃ

নিজেকে ভালবাসুন ঃ একজন মানুষের প্রতিটি দিনই ভালভাবে অতিবাহিত হয় না। কোন দিন ভাল যায় কোন দিন খারাপ যায় আবার ভাল খারাপ মিলিয়ে একটি দিন অতিবাহিত হয় অর্থাৎ প্রতিটি মানুষেরই একটি খারাপ দিন আসে যেদিন সে কোনকিছুই ঠিকমত করতে পারেনা বা যে আশা করে রাখে সেটি পূরন হয় না। এক্ষেত্রে নিজেকে খুব বেশী মাত্রায় সমালোচনা না করে বা তিরষ্কার না করে নিজের প্রতি যত্নবান হওয়া। যেমন ঐ একই পরিস্থিতি বা একই ঘটনায় আপনার কোন বন্ধু যদি ঐ কাজটা করতো, তাকে আপনি যেভাবে সান্তনা বা দয়া দেখাতেন ঠিক একইভাবে সেই আচরনটি নিজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করুন।

নিজের একটি শখ তৈরী করন অথবা নতুন কাজ শিখুন ঃ আত্মবিশ্বাস হচ্ছে একজন মানুষের সামনের দিকে এগিয়ে যাবার একটি মানসিক হাতিয়ার। এজন্য আপনাকে নতুন কিছু করার বা শেখার আগ্রহ তৈরী করতে হবে। যেমন হতে পারে বাগান করা, গান শিখা, কবিতা আবৃত্তি করা, বই পড়া ইত্যাদি।

অন্যকে সাহায্য করুন ঃ আপনার আশেপাশে যারা আছে তারা হতে পারে আপনার পরিবারের সদস্য, কোন বন্ধু, প্রতিবেশী, অফিসের সহকর্মী তাদের প্রয়োজনে বা কোন কাজে তাদেরকে সহায়তা করুন। এরফলে অন্যরা উপকৃত হবে, তাদের সাথে আপনার একটি সুসম্পর্ক তৈরী হবে এবং আপনার নিজের প্রতি একটি ইতিবাচক ধারণা তৈরী হবে, আপনি নিজেও ভাল থাকবেন।

নিয়মিত সুষম খাদ্য গ্রহন করুন ঃ পরিমিত খাবারের সাথে শারীরিক স্বাস্থ্যের মতো মানসিক স্বাস্থ্যের একটি নিবিড় বা ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। এর জন্য আপনাকে নিয়মিত এবং সুষম খাদ্য খেতে হবে। সকালের নাস্তা, দুপুরের খাবার এবং রাতের খাবার সময় মত খেতে হবে। খাদ্য তালিকায় অবশ্যই ফলমূল, শাক–সবজী এবং প্রচুর পরিমাণে পানি থাকতে হবে।

অন্যদের সাথে সম্পৃক্ত থাকুন ঃ একা একা না থেকে পরিবারের সদস্য, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন ইত্যাদি সবার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখুন। আপনজনদের সাথে সুস্থ্য সুন্দর সম্পর্ক বজায় রেখে চললে আমাদের জীবনের পথচলা আরো সুগম হয়। পেশাগত এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে বিভিন্ন ব্যক্তির সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখলে একাকীত্ববোধ কাছে আসতে পারে না।